প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৭
জুন ১৯৬০

প্রকাশক : বারিদবরণ রায়
মিলিতকণ্ঠ প্রকাশনী
৮৮-এ রায়বাহাদুর রোড কলকাতা-৩৪

মুদ্রক :
সোমনাথ সাহা
জয়গুরু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৩/১ হায়াৎ খাঁ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : সুকুমার ঘোষ

শ্রীমতী-কে

সূচীপত্র

বধ্য অবধ্য

মুখবন্ধ

দুজন সহযোগীর সমবায়ে প্রকাশিত আমার প্রথম উদ্যোগ 'আদিবৃত্ত'। সে ছিলো যৌথ উচ্চারণ, অভিন্ন মলাটের 'সমস্বর' নাম তাই যথার্থ। গ্রন্থশেষের অনুভাষে মল্লিনাথের বেনামে যে-ধারণা ব্যক্ত করেছিলাম তা মোটামুটি : কাব্যপ্রেরণার সর্বৈব কারণ অতৃপ্তি। একই অমোঘ তাড়নায় লোকে বিশ্বময় এতো দৃষ্টান্ত ও সদ্ভাবশতক সত্ত্বেও নিজে ঠেকে শেখে। নতুবা, বৈশ্যপ্রধান এক মফস্বল শহরে বিংশবয়স্ক তরুণের মনে নতুন সৃষ্টির আর কি প্রবর্তনা থাকতে পারে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অষ্টকে' (১৯৬১) ধ্বনি ও ধ্যানের দুই থামের মাঝখানে এক দুঃসাহসিক দড়ির খেলায় মেতেছিলাম। নানা তথ্য ও তত্ত্বে মঞ্চ ভরিয়েছিলাম , অথচ আমার ভূমিকা ছিলো নগণ্য।

এ-গ্রন্থ যে প্রারব্ধবর্জিত নয় শুধু সেটা বোঝাবার জন্যে, ভূমিকা লেখার চল নেই জেনেও, দু-চার কথার অবতারণা, নতুবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুভবের ক্ষেত্রে অন্যনিরপেক্ষ।

এ-হেন অতুলনীয় শিল্পে সমালোচকেরা খোঁজেন নজির ; পক্ষান্তরে শিল্পীর কারবার জীবিত দ্যোতক নিয়ে—যেমন ভাষা একটি, রঙ একটি, স্বরগ্রাম একটি। বধিরকে কি গান শোনাতে যাই, না, অন্ধকে দেখাতে যাই চারুকলা ? গায়ক বা চিত্রকরের তবু প্রকৃতিদত্ত কবচ আছে—প্রতিপক্ষের চোখ বা কান। লেখকের সম্বল শুধু আত্মাভিমান। তার সৃষ্টির ভৌতিক উপাদান যৎসামান্য—অথচ যাবতীয় শব্দের যথেচ্ছ হেরফেরে একটি চর্চরীও অসম্ভব।

স্থানকালের অনীহায় মাঝে মাঝে ভেবেছি—কার জন্যে লেখা, কে পড়ে ? তবু অতৃপ্তি যেহেতু যায় নি, লেখার তাড়নাও তাই থামে নি—অহরহ সংস্কার-মার্জনাতেই বস্তুত তার কিছুমাত্র রাশ টানা গেছে। ইহলোকে মরবো জেনেও যেমন দিনাতিপাত করা, নেই-পাঠকের জন্যে লেখাটাও বুঝি তেমনি।

পরিশেষে, কবিতা ভেবেই যা রচনা করেছি তা অবধান করার ভার (নিরবধিকাল আর বিপুল পৃথিবীর) রসিকের : চীনা কবি তাও য়ুয়ান মিঙ ওই ভরসাই করেছিলেন।

মৃন্ময়ী তোমার তুল্য

যা-কিছু ভেবেছি

যা-কিছু ভেবেছি সব
অসমান জমির উপরে
এখানে বকুল এটি, ওটি বা শিরিষ।

দুদিন বাদেই যারা দুর্লভদর্শন
সেই সব কুমারীর মুখ
গণ্ডীর ওধারে ফেলে রাখি।

সময় কি বড়ো বেশি ভুলো ? না কি সব
আদুরে ছেলের মতো
বায়না মিটলে ফের বায়না ধরে ?

আমি—এ-আমার মুখ,
হৃদয়ের দুই তীর্থে একজোড়া কান :
অতীতের দুরাশার পুনর্মুদ্রণ।

'ভালোবাসো ?—সদুত্তর নেই,
'বাসো না ?'—নীরব।

যখন উঁচুতে যাই মনে হয় ছিলো যা রয়েছে,
যেই নামি—হীরে-খসা রুপোর আংটির
গণ্ডী অহেতুক।

নিভানন বলে

নিভানন বলে চাঁদকে কখনো দোষী
করতে চাই নি আমি বা আমার ছায়া ;
যেহেতু জানি না বৈদিক ক্রন্দসী
কিসে অকাতর—তৃষ্ণা না অশনায়া।

তুমি তার পাশে নদী হয়ে বয়ে যাও
আমাকে কচ্ছ ঘাট করো শৈবালে,
দুটি আমলকি ফলের আদলে দাও
ঠোটের স্পর্শ জরা-গর্হিত গালে।

তবু তুমি চাঁদ, তোমাকেই নিভানন
বলা সাজে, তাই গুল্মগোপন ঘাটে
থাকি, তুমি যাও—যেদিকে সন্ধ্যা হন
পুরুষবিমুখ, ছেলে আছড়ান পাটে।

সহসা হাওয়ায় শিখা সরে যায় যার
হাতের আগলে তুমি সে মিয়োনো বাতি,
কখনো লগির ছায়া হয়ে পারাপার
করো বা কখনো ভেজা গুণে পাও ভাতি।

যাই হোক, তুমি নিভানন চন্দ্রমা
বলি না-ই বলি রইবে জ্যোতিষ্কই,
চিদম্বরমে যতোই আঁধার জমা
হোক, বিদারণে কে বা আছে তুমি বই ?

অন্যমনে বসে ছিলে

অন্যমনে বসে ছিলে, মুখ-খোলা বয়ামের মতো :
সময় সূর্যের ঘণ্টা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে
মুখখানা লাল করে গেলো মৌন দূরে।

এই মাত্র সন্ধে হলো, ধনুর্বাণ-হাতে
দুষ্মন্ত গেলেন তাঁর অভিজ্ঞান দিতে।

সশরীরে প্রত্যেকেই উপস্থিত আছি।
প্রত্যেকরই হাতে মিহি রেশম কুসুম।
তুড়ির টিপ্পনী দিতে সাত হাত জিব কাটি তবু।

মৃন্ময়ী তখন মৃত

মৃন্ময়ী তখন মৃত ডালায়, শিশিরে।

নবমী শীকর শুষে ডেকেছি, সুন্দরী,
কানে কানে—সুন্দরী সে ডিম্বাকার মুখে
ফুস্কুড়ি গালার ছলে ডান দিকে হেলে।

ডালায় থাক না ফুল সুধায় জিয়োনো,
সবাই কাঁসারী নয়—বদল বোঝে না।
সুন্দরী তুমি কি আজ প্রতীক্ষায় আছো ?
পানপাত্রে ধাতু আছো, সুধাপাত্রে তাড়ি ?
ঢালা-উপরো করা যায় এমন সংবাদ
তোমাকে বুদ্বুদে ঢাকে শিরোনাম দিয়ে।

যা-কিছু অতীত সেই নিক্তির ওপারে
সারারাত্রি এক রত্তি রূপের খোয়াব।

ব্যালাড

বাসনার রঙ জানি না নীলা কি পীলা,
প্রেম যদি চায় ধনুকে পরাবো ছিলা।
'চোখের ভাষায় স্বর শুনে আধো আধো।
মটর ফুলের প্রজাপতি ধরে বাঁধো'
ভাবনা চিন্তা থাক তো শিকেয় তোলা
ঝাড়া হাত পায়ে প্রেমের পোষাক ঢোলা।
আমি সঙ হবো হরেক রকম বাহারে
ডারা ডিং ডাং টারা ডিং ডাং
ড্যাংকি ড্যাংকি আহা রে ॥

ফুলের ফর্দ হোক না লম্বা যতো
প্রেম যদি চায় সব শিক্ষাই ব্রত
'জুতো হাতে করে পাঁচিল টপকে যেতে
লটর পটর হয়েছি আনাজ ক্ষেতে'
বুকের উপরে অথচ গন্ধ তার
বিশাল শূন্যে দিয়েছে ডুব সাঁতার
মনের পাল্কি টানছে অলীক কাহারে
ডারা ডিং ডাং টারা ডিং ডাং
ড্যাংকি ড্যাংকি আহা রে ॥

কেউ ব্যথা দিলে সম্বল আছে ফোঁস
প্রেম যদি চায় দশবার উঠবোস
'হাওয়া লেগে যদি বাড়ি না ফিরতে পারি
কে কাকে বাঁচায় যদি লাগে মহামারী'
সুধা নিষিদ্ধ, সুধাকর আছে ছাড়া
মাতাল করুক স্বভাবকবির পাড়া
বুঝি তা স্বপ্ন বাজিমাৎ হলে যা হারে
ডারা ডিং ডাং টারা ডিং ডাং
ড্যাংকি ড্যাংকি আহা রে ॥

বাহু থেকে স্মৃতির আধারে

বাহু থেকে সে-ঘোষণা অগোণে মূর্ধায়, যেন তা সোনার
দীর্ঘ বাঁট গুপ্তি-সহায়ক, শুল্কের দোহাই পাড়ো
তবু শুল্ক-আদায়কারীর বুকে শেলদৃষ্টি হেনে
বন্দরে লুকোও—সেখানে অশুভ কোনো সিঁদুর শঙ্খের
সওদাগর হতে গিয়ে জাল বুনে মাঝি হয়ে যাও।
জলপরী ফুলপরী কিম্বা চিতাবাঘিনীপরীর
যে-রকম দিব্যদৃষ্টি—আমাদের নেই—কিছু পেলে
ভাঙা ডাল হাতে ধরে কাটছি-ডালে পা-রাখার হঠকার হতো ?
অন্যান্য মুক্তির মতো, তুমিও অতীতে, যতোবার
শাঁখা পরো এক ভেঙে আর, ততোবার শাঁখারীরা জানি
পাঁচটা আঙুল জুড়ে ডাকো, মুড়ে—লগ্ন গেছে—বলো ;
স্তম্ভিতকে সাক্ষী রেখে উবে যাও স্মৃতির আধারে।

যখন প্রবাসে

যখন প্রবাসে ছিলে, চুলের ডগায়
রোদ একটু বাল্যস্মৃতি থেকে
ধূসর ধানের ক্ষেতে ধাবমান।
এখন প্রবাসে এই এক-দুই সাতাশটা উনুনে
সকালের কয়লা পুড়ে বিকেলের অন্ন পাক হলো।
ত্বরান্বিত বেলা আর মদির বৃষ্টির মাঝখানে
প্রবাসের সুদূর আহ্বান
ছিলো বর্ষা-প্রতিশ্রুতি, আজ তা-ও নেই।
তোমার চিকন হাতে চিক চিক জল
আর ঠোঁটে অনির্দ্ধ্য চুমুর স্মৃতি
বাসিপাত্রে জলের দাগের মতো
ম্লান।

তোমার বাগানে

তোমার বাগানে
বড়ো বড়ো লিচুগাছ,
পাঁকের জেলিতে
মুখ কাচে ইচেমাছ ;

মাছেরা যখন
খয়েরি আকাশে ডুবো,
অনিমেষ তারা
হয়ে যায় কানাকুবো।

বাগানে তখন
জ্যোৎস্নার খড়খড়ি
দমকা হাওয়ায়
খুলে ওঁৎ পাতে মড়ি

ঘড়ায় পুরোনো
নেশা বুড়বুড়ি কাটে,
হঠাৎ হাঁচিতে
মুখ ফোটে বুক ফাটে।

নখে-চেরা দাগ
যতোই পুরোনো হোক
বাগানে তখন
নতুন নতুন লোক

দেখায় দিব্য
কৃত্তিকা অশ্বিনী :
দৃশ্য পণ্ড—
ভণ্ড তপস্বিনী।

এইখানে, এখনি গোধূলি

এবার শরৎ গেলো আশ্বিনের জীবদ্দশায়

আমাদের চেনা ধাতু অ্যালুমিনিয়ম
সহসা পিতল কাঁসা ঠুন করে বাজে
ধুনুরি যেমন করে কার্পাসের ঝুঁটি
খুলে দেয় মাঠের ভিতরে

না-জানি নদীর জল
কতোখানি হাঁপিয়ে উঠেছে
দাঁড়াবার খুঁটি পায়নি বলে

কথাও সহজ নেই, অবশ্য শ্রীমতী
ওঠা চুলে থুতু দেবে, চিরুনির দাঁতে
টংকারে ওড়াবে ধুলো, খুস্কি, মরামাস

সে-কথার প্রতিধ্বনি এইখানে, এখনি গোধূলি

প্রসাধন

অবশ্য এদিনও কোনো কম্পিত কুলিশে
দু-খানি মেঘের বস্ত্র পুড়ে যায় নি, তাই
দরজা দিয়ে হাওয়া তোলে জানলা দিয়ে হাই,
বৃষ্টির সপসপে হাতে তুড়ি থাকে মিশে।

বাংলাদেশে দুই জোড়া পা ওঠে পা নামে

এই যে সতর্ক জল, কিন্তু পরিণামে
স্বচ্ছ পানা স্বচ্ছন্দ মুকুরে, মুচড়ে ওঠে
অসাধ্য সাধনা অতিব্যবহৃত ঠোটে।

কথা বাড়াবো না

কথা বাড়াবো না, রমণী দুর্ঘটনা,
দীপের সত্তা নিবু নিবু ফুলবনে,
বর্ষা যখন আমারও কলঙ্ক না
তবে আমি কেন দীপ নিয়ে যাবো রণে?
রণযাত্রায় রমণীরা কেন আগে?
পিছনে কেন বা বাঁটুল ভাঁড়ের দল!
সংখ্যায় চমূ বুঝি বেশি বেশি লাগে—
কথা বাড়াবো না, আমি তবু দুর্বল।

কথা বাড়াবো না, নাম ধাম কেন বলা?
পথচারী কেউ যায় যদি যমপুরে—
গৃহস্থহীন ঘরে তিন রাত গলা
উপোসে শুকোলে সে কি তিন হাত ঘুরে
নচিকেতা হবে? কিম্বা সে হবে কচ?
তবু সংকোচ, নারী নেই বলে, ক্ষীণ;
পথের উপরে ফেরারীর মচমচ,
কথা বাড়াবো না, চকিতে মিলায় দিন।

কথা বাড়াবো না, ভীরু বর্ষার গান
শমে এসে আর গেলো না একটি পা-ও,
শ্রোতা কি তোমার জানতো না সন্ধান—
তবে হাটে মাঠে শুধিয়ে বেড়ায় ভাও?
উর্বর মেঘে রমণীরা অঞ্জল
পাতে—যতোদিন গর্ভধারিণী তারা,
শুষ্ক চিহ্নে স্বাদ স্বেদ গলাগলি;
কথা বাড়াবো না, রমণীর পালা সারা।

গৌড়ীয় বিলাপ

প্রথম বিলাপ

অর্থাৎ সে-টুকু ভালো, যে-টুকু তোমার
কাছে গেলে চেনা যায় ভালমন্দ সব,
উদাস প্রতীক্ষা থেকে অগোচর নুড়ি,
মুক্তো বলে ফেলা যায়—যা-কিছু জলের
গবাঙ ডুবুরী। হিতার্থীরা এতোদিন
সুদূরে তোমার মতো দুঃখের বেলুন
অতিকষ্টে ফুটো করে, তাদেরও জাহাজ
মাস্তল মাল্লার স্বপ্নে বিনিদ্র স্মারক।

রোদের দাপট সয়ে ক্রমাগত বাড়ে
হাতের মাদক লতা, অঙ্গভঙ্গী, ভুরু,
সনাতন দেবতার ঐশ্বর্য ছাড়াই
যতো রূপ—সোনারও-কলঙ্ক-আছে ন্যায়ে—
অসার সকল বস্তু, চিহ্ন অবয়ব।

তাও তুমি ধরে থাকো হাওয়ার চাকায়
যে-পর্যন্ত মাটি দগ্ধে পাত্র হয়ে যায়,
যে-পর্যন্ত নদীর হৃদয় খুঁড়ে জল
আঁজলা মুড়ে পলিমাটি, মুখের বিভূতি
তৈলচিত্রে লাল নীল পলেস্তারা হয়।
ধরে থাকো, শব্দের বিচিত্র মুণ্ড ধড়
—দেবতাও এতো সুখে হাসতে ভয় পান।

বৃক্ষ লতা বৃষ্টি উৎস এ-ভাবে কাঁদে না,
কিন্তু যারা প্রণয়ী, তারাই শুধু ভয়ে
জিহ্বায় হীরের টুকরো চোষ্য করে রাখে।
সাধ্য নেই, কুঞ্জ ট্যাক্সি কাফে-র আড়াল
প্রণয়ীরা পুষে রাখে বার্ধক্য অবধি।
সাধ্য নেই, হংসতর কোনো দৃশ্য দেখে
ঠোটের প্রথম ফল দাঁত দিয়ে ছেঁড়ে।
সাক্ষাৎ অস্ত্রের সামনে এই যাদুঘর—
কারু-ভোলা মসলিনের দু-তিনশো বছর
সামনে যদি মেলে ধরে হারানো সন্ততি,
তাতে-ও তফাৎ কই ? বলতে পারো, আছে,
টাঙাইল শান্তিপুরী কিম্বা ধনেখালি
এদের শিরায় রক্ত, মাকড়সারও আছে।
অথচ ইন্দ্রের মতো আদিস্পর্শকারী
আমার পলককেতু যে-দৃষ্টি হারায়
তার কোনো আজ নেই, ছিলো-ভবিষ্যতে
অধমাঙ্গে দৃশ্য যেটা উত্তমাঙ্গে দশা।

দ্বিতীয় বিলাপ

পাতা দেখে গাছ চেনা কবে ভুলে গেছি,
অথবা ফলের স্বাদে বিরহ বয়েস।
ইড়ি মিড়ি কিড়ি তোমরা বাঘ ধরে পালো,
অথবা খাসীর পায়ে লম্ফ-নিবারক
টানা বেঁধে চারা বোনো, মহীরুহ দেখো।
ধাতু ছিলো : নানাবিধ প্রয়োগবিধিতে
কালস্রোতে ভাসমান শিলাবৎ আছে।
ভেবেছি আমার জন্যে পৃথক নরক—

সেখানে ইঁটের যোগ্য বেলেমাটি ক্ষার
স্পর্শযোগ্য বায়ু, আছে ফল বুভুক্ষার
দাহ্য বস্তু, মনে বজ্র আঁচের আগুন।
এখন গাছের নিচে বাঘছাল ছায়া
ডালে শক্ত ইড়ি মিড়ি কিড়ি-র বাঁধন।
স্বর্গ ছিলো—যতোদিন দেবতা ছিলেন,
কাউকে তারা শঙ্খ, কাউকে পিনাক দিতেন।
গ্রহীতারা আজ কেউ বর্তমান নেই
উত্তরের দশা যেমনি প্রশ্ন পরিহারে।

এখন পিছন ফিরে দেখা যায় দূরে
ছায়ামূর্তি 'কেও?' বলে চলে যায় ওই।
যখন সিদ্ধির ফল হাতে করি—'একি!
অন্য কোন বিষয়ের অধমর্ণ স্বাদ।'
কবে যেন বৃষ্টি হলো মনে করে রাখি,
কবে যেন ত্রাণকর্তা নৌকা দিয়েছিলো
মাঝগাঙে হাবুডুবু খাওয়ার সময়
এইভাবে। যতো দৃশ্য হাতছাড়া হলো
সব পিল্লে আজও খাড়া সাধ ববাবর
মাঝে ফাঁকা, তাই শব্দে বিকট আওয়াজ
আর অশ্রু। প্রণয়ীরা ঘরে বন্ধ নেই,
প্রণয়িনী পিল খায় অনন্তঃসত্বার,
রোগালয়ে কিম্বা কোনো আরণ্যনিবাসে
অন্য কারো বেশ পরে নিয়তি রমণী
বেশ সুখী। অতঃপর বিমর্ষ নাটকে
অহেতুক ভয়ে কোনো স্বপ্নের লণ্ঠন
গর্ভের সকল তেল বাষ্প করে জ্বলে।

এতোদিনে আগেকার শৌর্য বীর্য ভুলে
আমি যাচ্ছি এবং আমার পরে তুমি;

চিনতে পারো?   সামনে মেলা সেই ঝরা পাতা
যা কোনো গাছের ছিলো—সেই গাছ নেই।
যে-গাছ এখন বাড়ে তার ছায়াতলে
বাঘ নয়, মন মজে হরিণ শিকারে।

তৃতীয় বিলাপ

যখন গল্পের মোড় ফিরে যায় নারীদের দিকে
আয়না থেকে ম্লেচ্ছ জল মুখের গামছায়
নিংড়ে নেয় পরবর্তী আশার কুহক।
হাওড়া-ব্রীজ মনুমেণ্ট মোহমুক্ত দেখা হয়ে গেলে
অহিচ্ছত্র পুরীগুলি একসূত্রে মৃত হয়ে যায়।
তখন বলার মতো শব্দও থাকে না
হাঁটুতে উপুড় করা হাত দুটো পিকদানি পথে
পূতি হয়ে অম্লান কিংশুকে থাকে বেঁচে।
বহুদূরে হয়তো কোনো গ্রীষ্মাবাসে গিয়ে
দেখতে পাও ঠিকরোনো চুড়োয়
আততায়ী ভোরের ঠিকানা ভুলে
তোমার বুকের লক্ষ্যে বজ্র সোজা নামে।
আর তুমি যাকে চিনতে নদীর কাটিমে
সামান্য ঘুরিয়েছিলে অক্ষ ভোরবেলা
কিনেছিলে যার জন্যে গন্ধতেল হবিষ্য সাবান
বেনের ফতুয়া দেখে ভেবেছিলে বেনে বউ কানা,
সন্ধেবেলা পর্যাপ্ত মদের ফেনা শুঁকে
শুনেছিলে সে-নদী এখানে পেট ফেঁপে
পোয়াতী বধূর মতো বপ্র মোহানায়।

যখন গল্পের মোড় ফিরে যায়,
দোকান বুড়িয়ে যায়, বুড়ো দোকানের
বালতিব্যাগ কিতে ক্রীম ডেট-ক্যালেণ্ডার

ফ্লোরেসেন্ট টিউবের কাঁপা কাঁপা আঁচে
পাকাপোক্ত খুঁতো হয়ে বাঁচে
স্থির পক্ষ্ম এবং যৌতুকে পাওয়া হাতঘড়িগুলি।
আমুদে নেশার মতো মোড়কের সর্বস্ব পেঁচিয়ে
ফুৎকার জটিল করে অর্থের ফুরনে
কেবল একের পরে দুই ও দুইয়ের
যথাক্রম খুঁটো উপরে বাইরে চলে যায়
নক্ষত্রের প্রেতলোক শ্মশানবন্ধুরা।
আমার দুরাশা, আমি কাকে পুড়িয়েছি?
অভিন্ন হৃদয় খুলে ভিড়িয়েছি কোন জরাতরী?

যখন গল্পের মোড়ে ভিড় কেটে পাতলা হয়ে আসে
পুট করে খুলে যায় দ্রষ্টার দেয়াল।
যাদুকর পিতা যাই শিষ্যকে সন্তান আর
যাদুকে সম্পত্তি করে পাঁজাকোলা করে; সে-সময়
মকাই পাকানো রোদে গল্পের পরীরা
শুকো স্বপ্নে হেজে মজে গেলো।

যখন গল্পের মোড় ফিরে যায় আকাশের দিকে·

চতুর্থ বিলাপ

প্রত্যহ সে-রূপ দেখি উন্মাদনাকর,
তাকেও বিজিত রশ্মি সাড়ম্বরে ঘর খুলে দেয়
—কোমরে ঘুনসির সঙ্গে চাবিটাও ঠিক করে বাঁধা।
যা-কিছু নরম্ম শুভ্র চাঁদের আখের
মিটিয়ে তুমিও যাবে, আমি তো আগেই।
ধুলোর মসলিন গেছে ধুলো হয়ে ফের;
সাময়িক উত্তেজনা—সে-রূপ যখন গেছে ভুলে—

নিভে গেছে যেমন ফলের আভা
বৃক্ষে এক, কিন্তু আর রূপসীর গালে
পাণ্ডু, তবে উদয়কালীন।

এমন পুরুষ কেউ ফলবন্ত নেই, এমন নারীও
যার দাঁতে রক্তপাত কদাপি ঘটে নি,
এমন বান্ধব আর কয়জন আছে—
যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় বাক্যবিনিময়ে
সে তার কুঁজোর থেকে জল ভরে দেয়,
শুতে দেয় বান্ধবীর পাতা বিছানায়,
নিজের ঘুমের পিল বিলি করে বদান্যতাবশে।

বলতে পারো, এইভাবে পৌরাণিক সব
শাপমন্যি ফলে যাচ্ছে, আর দেবতারা
মরা গাছে ফলে আছে জোনাকির তোড়া,
ভূলোকের রমণীরা বরণ করে না আর
ওই সব ধৃতশস্ত্র হরিতাক্ষদের।
তবু যা মানার কিছু অমান্য করি নি,
প্রাজ্ঞ নই; অস্ত্র তাই ভুলেও ধরি না।
শুধু পথ-প্রহরীর মতো
নির্ভুল নিশানা দিই, তবু ঘটে
দৈব দুর্ঘটনা—তবু সেটা ঐশ্বরিক সীমারেখা নয়,
আর এই অজ্ঞাতবাসের
কোল ঘেঁসে মরত্বে চলি, প্রত্যহের অমরত্ব চেয়ে

পঞ্চম বিলাপ

কেন এলে? ভক্ত যদি একথা শুধোয়,
কেন এলে? ফুল যদি মর্ত্যে ফিরে এসে
লোকের বাসনা সব কেড়ে নিয়ে যায়।
এমন কী শস্য আছে চাষী যা কাটে না,

গোলাজাত অন্য কোনো ফসলের পাশে
উনুন জ্বালে না কেউ। কেন এলে? যদি
তোমার সন্তান এসে কখনো শুধোয়,
তুমি তার বউভাতে মৌরি চিবিয়েছো
কিম্বা যাকে কাঁধবদলের এক ফাঁকে
শেষবার দেখে নিয়ে তৈরি হলে নিজে,
এই সব। কেন এলে? জানতে চায় তারা।

কতো কী শেখানো হলো, ভুলে-যাওয়া সব,
শুধরে-নেওয়া ভুলগুলি। স্মৃতিউদ্ধারের
এটা নয় কিম্বা ওটা বা উদাহরণ
সমস্তই পুড়ে গেলো অচিরে চিতায়।
পলকা হাতে ফুলগুলি মুঠো ফস্কে যায়,
অবিকল সেই ফুল : আমি যা দেখেছি
সেই একটি দিনের বিমর্ষ বায়ুকোণে,
আমি যার সান্নিধ্যে ছিলাম, আমি যার
নাক মুখ চোখ কান বাজিতে হেরেছি
একশোবার। কেন এলে? তারা বলতে পারে।

না এলে কি এতো শব্দ হতো? না এলে কি
পুকুরের পাঁক তুলে তৈরি হতো চুলো?
না এলে কি মই তুলে চাঁদে যাওয়া যেতো?
এতোক্ষণ অকারণ ভয়ের ছায়ায়
থাকা গেলো—এ-ও কি না এলে ভাবা যেতো?

এই যে এতো পাড় গাছ মাস্তুল জাহাজ
পাটাতনে শেষ দেখা উধাও রুমালে
যাতায়াত, দেখা-হবে, মৃত্যুর খবর
রুচিকর খাদ্য চিঠি বেতার—এসব
জেগে থাকে সুনিদ্রার জরিমানা দিয়ে।

ষষ্ঠ বিলাপ

ভুল যা হবার, হয়ে গেছে ঃ
পাতালের মৌন থেকে ভয়ঙ্কর থারা
হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে মাঝখানে পড়ে
তাদের দাঁতের জ্যোতি আমাশায়বের হওয়া হালিসের রঙ।

সময়ে যা ফলে, বিপরীত
সেই সব ভুল, যা হবার হলো।
ক্ষুণ্ণ চিন্তা ট্রেনে কাটা পড়া,
পিছনে বিবিধ চিন্তা ধাওয়া করে
নরক অবধি।
সেখানে কি সন্ধি আছে ? বন্দী বিনিময় ?
আচমকা যুদ্ধের হুমকি
সমুদ্রের এপারে ওপারে ?
গোলাপের লাল কারো বুকের ব্লেজার
কারো বুকে শব্দে যায় মিশে
এক ভরি সিসে।
এ-সব ভুলের ঃ
বয়সা-ধরা কোনো কিশোরের
দুই তিন ঘাটে বাঁধা স্বর।

আকাশের চোখগুলো অবলীলাক্রমে
প্রথম-আস্বাদ-করা নির্জন সংলাপে
অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলেছিলো,
আর অকারণে, সেই ফুলের ভ্রূকুটি
সোহাগ উপেক্ষা করে
জ্যোৎস্নার জোয়ার ছুঁতে গেলো।

গোল চাকতি সময় এভাবে ঘুরে ঘুরে আসে।

পটু সাঁতারুর কাছে ডোবাটা যেমন
তেমন অদৃশ্য অঘটন
সময়ের হাতছানি দেখেও সতর্ক করতে ভোলে।
ফলের কোচড় থেকে খসে যায় বীজ,
প্রণয়ীর চুমু থেকে সুখ
সাফ-সাফ জবাবের মতো।
এখন তোমার হাতে চাকু নেই,
কন্ধকাটা কাল সেও কোনো কোনো ফলের উপরে
বুড়োবাবার চুন মেখে রাখে।

সপ্তম বিলাপ

আলোর প্রবেশপথে জলপাইয়েরা তেল ঢেলে দিলো,
আর কোনো শাস্তি বাকি নেই, বাকি নেই
স্বীকারোক্তি আর।
গোড়েমালা-প্যাঁচানো খোঁপার পাব আলগা করা
হাওয়ার দৌরাত্ম্যে তুমি, নিরপেক্ষ, বোকা।
সহ্য করো সরু তারে পাল্লার দাঁড়ির মতো টাল—
সুখ যদি ঢেউ দেয়, দুঃখ তাকে জলপাইয়ের তেলে
একবার চুবিয়ে ওঠায় ; যতো আলো
সকলের ক্বাথ ফেলে ফেলে
প্রথমে গেলাসগুলি, পরে থালাবাটিতে পিতোয়।
কথাগুলি অম্ল আর কানগুলি দড়কচা হলে
অপরাধ সব জমা থাকে।
উষার কুলায়-ছাড়া শামুকগিলেরা
সব কান্না পরিত্যাগ করে।
কি হবে ছাঁয়ার মতো ফোড় পাখনা খুলে খুলে গিয়ে,
বিষয়ের শাঁস নেই, হাতেও ক্ষেপণ কিছু নেই।
ক্ষমা করো, সময় আসে নি।

ফুলের ডানার মধ্যে মালসার আগুন
যজ্ঞের প্রসাদ-অশ্ব চরে এসে দানায় বিরাগী,
কপিকলে তুলে ধরো ঘাড়ের কেশর।
স্বপ্নের আলেয়া দেখে সব কিছু জাগতো, ভালো হতো।
ফলইয়ের লেজ হয়ে লগ্নগুলি জলে আর নেভে :
এখন তোমার হয়ে তপ্ত দিবালোকে
ফাঁসি যাবো, মঞ্চ ঠিক করো।

অষ্টম বিলাপ

তুমিও গরল, তবে বিলম্বে জেনেছি,
তোমার সবুজ রঙে আমার গোলাপী
দাবার গজের মতো আড়াআড়ি যায়।
ঘটনার ফল নিত্য, আখ্যান সহসা,
ফলের দর্পণে তার পিছনের পারা
গাঢ় বলে কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষে
অপ্রকাশ তারার কৌশল যার জানা সে শিশির ;
এবং আলো যে আলো তারও বিষ আছে
স্ফটিকের লক্ষ হাত ফুটলেও স্ফটিক।
প্রার্থনা ছাড়াই আমরা বৃক্ষভাণ্ড থেকে
পরস্ব নিজের ভেবে মধু লুটি, বনে
কিছু থাকে বড়ো গাছ—যাদের তলায়
আগাছার হৃৎপিণ্ডে ষড়ঋতু ধুকপুক করে।
এখন শার্সির নিচে বসে দেখা যায়
দূরের রথের চাকা হেঁইয়ো টানে নড়ে।
মানুষের সৃষ্ট দীপে ঘুমিয়ে যখন
জাগবে, সেই একই বাহুলতা
দূরের স্মৃতির মতো স্তবে তুষ্ট করে
অমরত্ব চাইতে পারে, তাকে
বলবো—তুমি যদিচ আগুন

একটি মাত্র কাল্পনিক উদ্ভিদে রয়েছো,
আমি তাকে দেখেছি মেঘের
অণুমাত্র ফাঁকে, আশু যবনিকাপাতে।

নবম বিলাপ

কাউকে আর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে বলি না।
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যে-সব উরুভঙ্গ রক্তপান ছিলো
একমাত্র অছিলায় পিছলে গেছে পিছে।
আমিও এগোই তেম্নি : গুলতি থেকে
টি, এন, টি প্রলয়ে।
এতো-যে সুন্দরভাবে সূর্যোদয় দেখা।
অথবা সূর্যাস্তে ভিড়ে পাল তুলে
ভিন্ন তটে নিরুদ্দেশ হওয়া—
দালানেব গাঁথনি-ঢিল-করা
ন্যগ্রোধের অমোঘ উদ্যম—এ-ও দেখা :
তবু সব চাকা ঘুরে যায় :
পিণ্ড আর পিণ্ড থেকে রূপ।

দশম বিলাপ

অভীষ্ট চেনার আগে সান্ত্বনা দিয়ো না, একথা যখন বলি
বুঝো, আমি ভুলের শিখরগুলি গুঁড়োতে এসেছি, এইখানে
হেঁটমুণ্ডে বসেছিলো যৌবনের ছায়ামূর্তিগুলি, পাছে কেউ ভয়ে
প্রকাশ্যে চাউর করে লাভ লোকসানের খতিয়ান। কেউ কাছে নেই?
কেউ কি উল্লেখযোগ্য ক্োনো কিছু করবার যোগ্য হয়নি আজও?
সবাই পরের ঘাড়ে বন্দুক চাপিয়ে দিগ্বিজয়ে যায়;
অথচ আমার দেশ—এ কেউ বলে না, বড়ো জোর—এই দেশে
মোটামুটি স্বচ্ছন্দে রয়েছি—বলে, আর এরই মধ্যে হাই তোলে

দশ-বিশবার ; এই ভালো, সান্ত্বনায় কারই বা কতটা
যায় আসে ; অভীষ্টই নেই যদি, কে তুমি কে আমি,
তোমার রঙিন ঠোঁটে কয় গণ্ডা চুমু আমি খেলাম-না-খেলামের
চৌহদ্দি বড়োই ছোটো। যৌবনের ভাষাও অকেজো।
এখন কাছেও কেউ নেই যাকে পদার্থের ঘনত্ব শেখাবো,
বলবো কিসে লাল হয়, কতো ডিগ্রি তাপে মোম গলে,
আবার জমাট বাঁধে কতোখানি তাপ সরে গেলে।
পঁয়ত্রিশ বছর তুমি স্মৃতি জুগিয়েছো,
মফস্বল কোলকাতা এ-পিঠ ও-পিঠ তুমি করিয়েছো কতো লক্ষবার,
এ-কথা সে-কথা করে ভুলিয়েছো হেমন্ত নিশিন্দাবন, হিঞ্চে, থানকুনি।
হৃদয় যাকেই দাও সেই বলে আগে যদি হতো
প্রতিটি মুহূর্ত্ত বুঝি এক দুই তিন চার পিল্লে-ভাগা দেওয়া
তাদের সমান্তরাল একটি কাজ খুলে ফেলা, একটি বন্ধ করা।
বোতলের ঠিক ছিপি লক্ষেও মেলে না,এই ভাবে রসাতলে নেমে
ভোরের ঝর্নার নিচে শ্রদ্ধার গণ্ডুষ পেতে চুপ করে
অপেক্ষায় থাকা, মাঝেমধ্যে এ-ঋতু সে-ঋতু এসে
হৃদয়কে স্তোক দেয় পাকা চুলে কলপের মতো।
বীরের অনেক কাজ বাকি—বীর হও,
লেখার আঁকার নাকি গীতরচনার বহু বাকি শুরু করো :
এই সব দড়ি ছিড়ে কতো দূর যেতে পারি আমি ?
বরং তত্ত্বের বশে একটুকরো গিনিপিগ—সে-বাঁচা সহজ।

তত্ত্ব নয়, বরং উত্তাপ দাও
পূর্ণদগ্ধ কাঠে ;
বাণী নয়, ইষ্টবেধ
মৃত্যুবাণ দাও।

যা-ই সাক্ষী মানো

পাখিরা

আমার আনন্দ-সন্ধ্যা
তোরাই কুড়োলি কোছে আলগোছে
শালিক চড়ুই।
নিমেষে নিমেষ জুড়ে
চলচ্চিত্র এই ধরণীতে
বৃষ্টি ভাসে ডোবে সরসীরা।
এ-কিন্তু ব্যাধের রাজ্য
মৃতদেরও চোখ সদা লক্ষ্যবদ্ধ তীর;
কান দুটো খাড়া রাখ,
কুটো ফেলে মুখে ধর পলি,
নরম পালকে ঢাক ভস্মমুক্ত পুরী।
ছাখ, এই বাসার তলায়
রাতের কামান্ধ বৃষ্টি
জাতক শিশিরে।

নক্ষত্র

সবই কি তাহলে
নীহারনিস্পন্দ পাতা
ঢলে পড়ে উষষীর কোলে?
নেই আর আনন্দের জের?
কেউ নেই, মরা মুখে বুলি
ফোটাবে এমন কোন স্বাগতবিধাতা?

তবে এই রজনীকুঞ্জের
সারসনে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগুলি
একে একে ভোঁতা হয়ে যাক।
অথচ জানি না এই সান্ধ্যকৃত্যে কে-ও
পদ্মের সোহাগ, নাকি
টেনে ধরে বিপথের কাঁটা?
ইচ্ছামৃত্যু প্রাণপাখি
এখনো অদেয়,
বৃথা তাই গলাফাটা
সহোদর হাঁক।

নদী

দেশের প্রত্যক্ষ শিরা, দীর্ঘ শোনধারা।
বাহিত পল্বলে জাগে শ্যাওলা শবদেহ,
স্রোতের গলুয়ে বেঁধে নিয়ে যাও হেমচ্ছটাগুলি।
আমাদের আস্পদের ব্রহ্মরন্ধ্র দীর্ণ করে ঝাঁপ দাও,
নর্তকী উপলে জমে অর্ধ রাকা অর্ধ সিনীবালী।
একই স্তন্যে শৈশব যৌবন পায়, বার্ধক্য যৌবন।
আদি নেই অন্ত নেই— কণাই প্রবাহ—
এই তো এখানে ছিলো, কই সে কোথায়?
তোমার পীযূষ-সত্তা ইলিশ ওষধি।
ঋতুআখ্যাপক নদী, তোমার অস্থির
তরল স্বপ্নের বুকে আমাদের টলোমল আয়ু।
নামি বা না নামি, জানি, ভরাডুবি হবো,
জরায়ুজ আমাদের জন্মই স্মারক;
এবং কান্নাই যার উত্তরাধিকার
মোহানায় আমাদের সেই জন্মান্তর।

রক্তিম গোলাপ

কি সুখে, গোলাপ, তুই
আনন্দমুখরা ?
এ-কুঞ্জে রোদন ওই
শোনা যায় দূরশ্রুত বাঁশরীর মতো।
মোম যে অতনু
সেও জ্বলে ফিরে পায়
দিব্যকলেবর। কিন্তু তোর
পাপড়ি খুলে উত্তর কে চায়
'মৃত না জীবিত ?'
সুবাস—আছিস্ তবে,
যদি নেই—রূপের কি দাম ?
রূপের বালাই
ঝেড়ে ফেলতে গন্ধ করে
পালাই পালাই সারা বেলা।
এ-বন্দীনিবাসে তবু
এক বিন্দু তুই
চিত্তের খনিজ রক্ত ঘনীভূত—
স্পষ্ট কাঁটা যাকে
পথভ্রষ্ট এ-আঙুলে অভিষেক করে।

বাড়ি

তোমার বাড়ি যাবো। তোমার মুখের মতো বাড়ি। চোখের মতো জানলা। ভুরুর মতো দরজা। নাকের মতো উঠোন। কানের মতো ঘুলঘুলি। চুলের মতো ছাদ। ছাদের মতো নাক। উঠোনময় চুল। জানলা জোড়া মুখ। ঘুলঘুলিতে ভুরু। দরজা-দেওয়া চোখ। সাদা-মোড়া নাক। নীল-মোড়া মুখ। লাল-মোড়া চোখ। হলুদ-মোড়া ঠোঁট। বেগনি-মোড়া ঘুলঘুলি। বাড়িটা ফিকে সবুজের ভিতর। লালের দিকে মুখ-করা। মেরুনের দিকে পিছন-ফেরা। ওমলেটের মতো বাড়ি।

মর্ত্যের শানাই

শব্দ তোর কানে আসে,
বুঝি নি কুবের
এ-বুকে লুকিয়েছিলো এত রত্ন কবে !
তুই যক্ষী, পৌরাণিক
লাস্যের ঘূর্ণীর তলে
আলস্যনবীন।
প্রত্যক্ষ নদীর মতো
নিরপেক্ষ তোর
একমাত্র উরুর উপরে
আমাদের লাজুক প্রণয়,
পিছনের ছায়া তবু কতো তথ্য দেয় ?
তোর এই আনাগোনা
একই ঘরে
ভিন্ন ভিন্ন দ্বারে,
এখানে আঙুল চাপি, ওখানে হুতাশ।

এই ভাবে ঠোটের বাঁধন কেটে
যে-মন্ত্র পালায়
তাকে ধরতে তুই নিশিদিন
আমার শ্রুতির নিষ্ঠা অবজ্ঞা করিস।

নহবৎখানা

সুনীল গম্বুজ তার
হাউই সফরী লাফে ছুঁতে গিয়ে
ডাঙায় আছাড় খেয়ে মরে।

সন্তানের রাত্রি, মাগো,
উড়ু উড়ু কিঞ্চিৎ কপিশ ;
ধবল বার্ধক্য এলে, জানতে দিয়ো,
সপ্ত-সিন্ধু বেড়া দেয়
কোন স্থলভাগের ঘরামি ?

মানুষের বসতবাড়ির
ছাদের মাথায় ওই নহবৎখানা ;
সকালের বাষ্প গলে
ভরালো রাত্রির নদী সমুদ্র তড়াগ।

স্থলপদ্ম

স্থলপদ্ম যত্রতত্র কুয়াশার পাতে
শুকিয়ে রয়েছে বেলা বাড়বার সাথে।

রোদ তাকে টোকা দিয়ে ঘুম ভাঙাবার
বৃথাই সাধনা করে, মালী যাকে ভুলে
দুপুরে খোঁচায় গোড়া, সেই আলবালে।
চৈত্রের টংকার কোনো কার্তিকের ঢাক
তুলবে না জেনেই কাঁসি কাঁই-না-না বাজে।

কিন্তু স্থলপদ্ম ফেলে কুয়াশার পাখা
উড়ে যাস সহচরী পদ্মের কুলায়ে—
ওর বীজে শাঁস খেতে শিশুরা কাঁটার
শাসানি উপেক্ষা করে জল ভেঙে ছুটে
কবন্ধ মৃণালে রাজা মহীর মুকুটে।

আমার নগরী

রাঙা মাটির পথের ধারে। রাঙা রথতলায়। রাঙা হাতের চেটোর নিচে। রাঙা স্বর কেঁচোর মতো। রেখাগুলো কুঁচকোয় আর এগিয়ে যায়। কিন্তু কিনারা দিয়ে গড়াতে পারে না অন্ধগলির মতো বা তেপান্তরে। মিশে যাওয়া পথের মতো শূন্যতা যাদের কপালে ঘন কালো। চুলের তলায় থমকানো তাদের দাখিলা দাগনম্বর। খতিয়ান-নম্বরের মতো অস্থিতিস্থাপক। দৃষ্টিগুলো আমাকে খুঁজে বেড়ায়।

আমি সেই নগরীর। যেখানে মকান আর দোকান বড়ো বড়ো। তৈল-চিত্রের বীরপুঙ্গবের ঠাহর-না-হওয়া। ভুরুর দুই সেতুর তলায়। ভস্মসাৎ গলার স্বর নকল করতে করতে রোদ্দুর। আমার পাশ কেটে নেমে যায় উঠে যায় ঘুরে দাঁড়ায়। সুবেশিনীদের মাথা নাড়ার অনুকারী বেণীগুলোর মতো কম্পিত। সুরের মতো তাদের অলকগুলি কপালের উপর শয্যা রচনা করে

আমার এই নগরীর। গত শতকগুলির মৌরসী চেহারা। উইয়ের পেটে হজম নতুবা দেখতাম নবাবেরা। খেলনা-হাতে বেগমদের। শিকল খুলে দিচ্ছে এই নগরী। দেয়ালে দেয়ালে বদরক্তমোক্ষণের বিচিত্র চিৎকারের পাঁয়তাড়া। এড়াতে এড়াতে আমি ট্রামে যাই রাজপুত্রের। উপনয়নের নেমন্তন্ন খেতে। যাই শেষ বাসে অপেক্ষা শেষ করে। ছাড়তে বিলম্ব হয়ে যায়

নগরকে গণতন্ত্র। দেওয়া হলো স্বয়ম্বরাদের। দেওয়া হলো রজ্জুনাস দেবদূত। তাদের ডানা আছে অশ্রু নেই রঙ আছে কিন্তু ঔরস। নেই যেমন পূর্তকারের দায়-খসানো তুল্যমূল্য রজনী নগরীতে। যখন আবার সূর্যোদয়

তুমি

আজ কাল এবং পরশু
তিনটের ওজন সমান নয়
এবং আজ্ঞা-ও

তোমার আঁজনি-ঝরা চোখ
আর দু-ঠোটের মাঝখানে
বাংলা রামায়ণের মলাটের হরধনু

কাল ও পরশুর মাঝখানে
তুমি আজ
গাবানো পুকুরের মাছ

সৃষ্টিকালে অবাধ্য ছিলে
তাই খোকা দুটো
পাল্লায়-হারা ছিঁচ-কাঁদুনের
সান্ত্বনা-পুরস্কার

অপাঙ্গে আরেকটি মুখ কোঁদা-ই ছিলো
স্রষ্টার অভিপ্রায়

হঠাৎ নিতম্ব গলে মাটিতে ঠেকে
পা দুখানা জমে গেলো

এমন কথা তোমাকে বলবো

যা তোমার কপাল চিরে গেছে
জেতার মুহূর্তে হড়কানো
রেসের ঘোড়ার মতো

যা তোমার চুলের গোড়ায়
স্পর্শকাতর শিশিরের
নিঃস্বার্থ ছাপ

যা তোমার সরু কোমরে
সায়া বাঁধবার দাগ
নিকেলের মতো ফ্যাকাশে

যা তোমার না শুনলেও চলবে
পৃথিবী আগের মতোই পুড়বে
চাঁদ আগের মতোই নিরেট হবে

আর আমার ঠোটের ডাইনে বাঁয়ে
আগের মতোই বাড়বে
কালো ঘাস আর কালো ঘাস

বুরুশ

বুরুশ দেখেছো সবাই—থুতনিশুদ্ধ উপড়ে আনা খোঁচা খোঁচা দাড়ি কারো : সে অতিকায়, আতাম্র ; দাঁত থাকলে থাকতে পারে, মাংস আদৌ নেই।

ওর ঝোপে একটি আলপিন পড়লেও খুঁজে পাওয়া যাবে। অক্ষরে অক্ষরে পালন করা কঠিন আইন ওর সম্বন্ধেই খাটে। আমাদের অজান্তে যে-সব জিনিশ সঙ্গদোষে আসে—সে-সব বিদায় করতে ওর জুড়ি নেই।

ওর উৎপত্তিস্থল সব ছোঁয়া-বাঁচানো এক জায়গায় আর কার্যকারিতা সব কিছু ছুঁয়ে। ন্যস্ত দায়ে ওর অগাধ আসক্তি, জীবনখাত ব্যাপারটা—ও ভাবে ওর একচেটিয়া।

যে-মানুষ ওকে সৃষ্টি করেছিলো, মমতা জিনিশটা তার কম।

তথাস্তু

আমি হোক বললেই
যদি হতো
তবে কারে কান
লম্বা হয়ে
ফলের ঠোঁটের কিনারায়
পিকদানি
হাত লম্বা হয়ে
নক্ষত্রের আঁচের সামনে
তাওয়া
নাক ছুঁচলো হয়ে
গোলাপের গর্ভকেশরে
ক্রোমোসোম

নেই বললেও
যখন থাকবো
রাস্তার পাঁচজনকে বরং
'আপনি ?' 'আপনি ?'
পাঁচ রকম শুধিয়ে
কখনো এর যদি
কিম্বা ওর সুতরাং

কাব্য

কেউ যখন কিছু
বাক্য আওড়ায়
তাতে ঠোঁট-নড়া থাকে
সস্তা আইসক্রিমের
পাটকিলে ঠোঁট

কেউ যখন কিছু
সুর করে বলে
তাতে হাত-নড়া থাকে
আপেল-ঝোলানো সুতলির
দোলনহীন হাত

কিছুই অভিনব নয়

মাছ

মাছের লক্ষ্য কিন্তু
অন্যদিকে
মানুষের শস্য যেদিকে নেই
যেখানে বিস্ময়
প্রেম বা স্বপ্ন
কৌতূহল মেটায় না
শুধু ভাবে
কেমন করে বলবো
কেমন করে জানবো

হাওয়া যা পরিবেশন করে
সেই কটাক্ষ বা রেশমি সুতো
যেখানে স্থির
সেই দিকে একদৃষ্টে তাকানো
নদী নালা
খাঁড়ি বা
উপসাগরের
মাছ

প্রতিধ্বনি

যখন উজান ঠেলে ফিরে এসি
দরিয়ার মাছ—
তখন কানকোয় তোর মুনের মুল্লেখ
পাতালের খরাদী আঙুলে।
ফেলে আসা যে-পয়ানে
হাওয়ার প্রেতাত্মা এসে
শুয়ে যায় খরার ক-মাস
সেখানে দিগন্ধ বার্তা
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফেরে।

কাঁকড়া

আমি কাঁকড়া খেতে ভালোবাসি। কাঁকড়ার ভিতর সুন্দর রস। কাঁকড়ার দাঁড়ার ভিতর চমৎকার শাঁস। কাঁকড়ার খোলা মুচমুচ করে ভাঙে। গালার মতো রঙ কাঁকড়ার।

আমি হাঙর খেতে ভালোবাসি না। আমি সীলমাছ খেতে ভালোবাসি না। আমি কুমীর খেতে ভালোবাসি না। হাঙরের রস বেশি গাঢ়। সীলমাছের শাঁস বেশি ছিবড়ে। কুমীরের হাড় বেশি মড়মড়ে।

কাঁকড়া খেলে আমার একখানা হাত বাড়ে। কাঁকড়া খেলে আমার একটা চোখ বাড়ে। কাঁকড়া খেলে আমার পিঠ দুখানা হয়। কাঁকড়া খেলে তিনঠেঙো হই। আমার দাঁড়া হয়। আমার খোলা হয়।

আমাকে তখন কেউ খায়। আমার ভিতরে সুন্দর রস। আমার দাঁড়ার ভিতরে চমৎকার শাঁস। আমার খোলা ভাঙার মুচমুচ শব্দ। গালার মতো রঙ আমার।

নভোপট

ধন্য পট, ধূসর বেলায়
নৌকোর কী দশা হলো দেখে যাও মাঝি
তুমি ধন্য, তীরে বসে চরাও ধবলী, গান গাও
লক্ষ মৃত প্রেমিকের সেতুর ওপারে
এ-মুক্ত ঝর্নার পরে যা-কিছু নতুন
সকলি দৃশ্যের মতো ঘনায়িত
কিছু মেঘে কিছু কুয়াশায়
কেবল বিলুপ্ত চন্দ্র জাতিস্মর হাসে

হায় নদী

নদীকে ডেকো না আর
সে এখন ফেলে আসা তটে
জেলেডিঙি পানা আর শীতের মাস্তুলে
ডাঙার তেরঙা রোদে মোছা

তেরছা বৃষ্টি—পাড়ের সুপুরিবন ঢেকে
অতীতের লগ্নগুলি শুক্রপাত করে

সাগর যেখানে আজ
জাল পেতে রাখে
সেইখানে মোহানায়
নদী তার স্বভাব হারাবে

হায় নদী
কামোট কুমীর আর কাছিমের
হায় নদী
সময়ের নষ্ট হৃদয়ের

বধ্য অবধ্য

এখন যেমন বলি

এখন যেমন বলি বায়োস্কোপ চল
তেমনি করে ফুল স্বপ্ন রমণী দেখেছি।
রক্ত—যা বাহুর মধ্যে চলাচল করে,
ঘোড়া—যাকে বাজি রেখে শুল্কলাভ হয়—
তাদের সকল সিদ্ধি ভোজবাজি ভেবে
দুয়োর ডিঙোতে যাই, অমনি বাধা পড়ে ;
কেন আমি—যখন দৈবের হাতে খাঁড়া—
মাথাটা নোয়াতে গিয়ে ইতস্তত করি।
অথচ কানার দৃশ্য ভয়ঙ্কর নয়,
যেমন বোবার কথা আহ্লাদের কানে।
দৃশ্য-যা ভয়ের—তার পিছু পিছু যাওয়া
আর আহ্লাদের কথা অতি ক্ষণস্থায়ী।

তখন গেলাস ভরা

তখন গেলাস ভরা জল ছিলো : চুমুকের আগে।
ঋষির ঠোটের কাছে বিষপাত্র এগিয়ে দিলাম, তবু
'হে দেব প্রসাদ দাও'—একবারও মনে হয় নি—বলি।
আগে কেউ মুখ দেয় নি,—এ-সেই গেলাস,
এই সেই বিষপাত্র—হাওয়া তাকে
বাটা বিউলি ফেটানোর মতো
ক্রমাগত নেড়ে নেড়ে, গর্ভে ঢুকে গেলো :
ঋষিরা যখন কিছু দেখতে চান, অন্ধ হন আগে।

বৃষ্টি, শস্য

ছাতি-ফাটা গ্রীষ্মে আছি ঘরে বন্ধ হয়ে
বই-মুখে গাড়ুর নলের মতো বাঁকা।
মেঘ যেই রক্তচক্ষু দেখালো ক-বার
হাতের রোমের মতো ঘাসের ডগায়
ভিজে ভিজে শুনি বাজে ঘাগর নাগর
বৃষ্টির দেবতা যিনি তাঁর শুষ্ক হাতে।

আমাদের শস্যগুলি উধাও শরীর;
এক আঁজলা জল—ভাবি অমৃত খেলাম;
আর যেই একমুঠ শস্য মুখে পুরি—
লালার ডাবরে ঢুকে তা-শুদ্ধ পানীয়;
বৃষ্টিশেষে সফেদ সোনালী তার মাঠ
দর্পণে ছোঁয়ার মতো সনাক্ত করেছি।

ক্লাবেই যাও বা কবিতাই পড়ো

ক্লাবেই যাও বা কবিতাই পড়ো। শূন্যের দিকে তাকাও বা উল্টো মুখে। কাউকে দেখার নাম করে বা কাউকে ছোঁবার নাম করে। এখানে আসো বা সেখানে যাও। ঘড়ির কারিগরের কাছে গেলে। কিছু একটা খারাপ হবেই। ব্যালান্স ষ্টাফ বা শরীরের ত্বক। এলিভেটর কিম্বা দেশলাইয়ের খোল। ক্রাইম ফিক্‌শনের শেষ ক-পৃষ্ঠা। এইসব তোমার মনে হবে। তোমার হাঁটুতে একটি শিকড়। গজাতে দিলে, কেবল ফুল আর ফুল। ডালপালা নেই। যেমন বাইরে থেকে দেখো ভিতরেও তেমনি। ন্যাপথলিনের গন্ধ। আর চুনপোড়া গালের মতো। খসখসে পাতা জুড়ে একটি খুনীর ছবি। আর একটি নার্সের। লিউকোপ্লাস্টের মোড়কে ভবিতব্যের সান্ধ্য চেহারা। নাকের ডগায় চশমা-ঝোলা অগোচরে।

ভৃঙ্গারের প্রতিচ্ছায়া দেখে

তখনো ঘরের মধ্যে, প্রত্যাবর্তনের
দরজা জানালা খুলে দিয়ে পালায় বিকেল
প্রতিটি নুড়ির গায়ে আঁকা ছিলো সুদূর আলয়,
দিবালোকে প্রত্যেক বিষয় থেকে ফাঁপা
মুহূর্তের চোখ ছিলো অছি যাদুঘরে।
কাটা ঘুড়ি, ভাঙা পাল্লা, বিষণ্ণ পালক,
দেরাজের তপ্ত খন্দ, তুমি তবু, দৈববাণী ভেবে
প্রথম ফেরানো কথা আড় করে ধরো।

ঘরের দূতীরা যারা হাতের আঙার সব ছুঁড়ে
চলে গেলো, তারা আর তাদের জোয়ার—
কাঁধের এপাশে কিছু ফাঁকা হাওয়া
ওই পাশে ঝরা ফুল গাজর রঙের—
তাদের বুকের ছোঁয়া খায় না পাখিরা ;
পালকের মন্ত্রপড়া দিন চলে গেলে
রাতের শয়ন কক্ষে বেড়ে ওঠে বাতব্যথাগুলি ;
তখনো ঘরের মধ্যে, আড়া ছুঁয়ে বাতি, বৃত্ত আলো।

কুকুর দেশলাই আর

কুকুর দেশলাই আর মোমবাতি নিয়ে
নিউটন, ভাবুন, এক কবিতা লিখতেন !
আলো কোনো কাণ্ড নয়, মূলও বলি না
যদি পাতা—মৃত্যু তবে পীত ক্লোরোফিল ?
নিউটন এমন কিছু তত্ত্বে ভর দিয়ে
প্রথমে কুকুর নিয়ে একবাজি দাবা,
তারপর দেশলাইয়ের দেরাজ ঘুরিয়ে
মোমবাতি ; শেষকালে সমস্ত উল্টিয়ে
শেষ ঘুম ঘুমোলেন নীরব কবির।

উলুবন, নলখাগড়া শর

উলুবন, নলখাগড়া শর
সকলেরই পৃথক ঈশ্বর
বলেছেন : এই নাও চাবি।

চাবিবদ্ধ সব ইমারত,
একমাত্র বুকের শরৎ
বলেছিলো—কি করে বাঁচাবি

সব কিছু, তাই উলুবন
নলখাগড়া শরের যৌবন
ভাবলো যদি হই নিরীশ্বর ?

তবু তারা চাবি খুলে দিতে
ভুলে গেলো : যা-ছিলো আদিতে
অন্তে এ কি তারই কণ্ঠস্বর !

স্থপতিরা

নক্সা হাতে স্থপতিরা বড়ো
চিন্তা করে : দেবো কি দেবো না
একটা থাম, দুখানা লিণ্টেল,
ভাবে একটু মাটি কম দেবো ?
যদি আরো খানকয় শিক
বেশি দিই, অথবা না দিই ?
ভাবতে ভাবতে নোনা ধরে ইটে,
কুয়োর ফোয়ারা যায় নিভে।
একটা সিঁড়ি চিলকুঠুরিতে
আরেকটা পাতাল ফুঁড়ে নামে
স্থপতির হাজা হাত ধরে।

হে ডুবুরী

শ্রীদাম—যে পদ্মায় ডুবেছে

ভাসমান জীবন তোমারও ছিলো মাঠে ঘাটে বাঁধা
বিশদ নিসর্গে ছিলো ভাঁট গাঁদা তারাফুল, আজ
এক-দৌড়ে-পার-হওয়া রক্ষেকালীতলার ছায়ায়
মুছে গেছে রুই কাতলা বাউশের আঁশের জলুস
উড়ে গেছে জ্যোৎস্না-চালে করোগেট ছনের নীহার
রাখাল পড়ুয়া কিম্বা তালপড়া পণ্ডিতমশাই
কানিভাঙা স্লেট নেতি শটকে-পড়া বাড়ন্ত বিকেল।

এই আজ : জলের তলায় খোঁজো মুক্তো বা প্রবাল
বা সেই ঝিনুক যারা ভরাডুবি রত্নের জাহাজ,
শোলের পোনার মতো ন্যাওটা পথে চলাচল করো,
উঁচু নিচু ডান বাম আছে থাকবে দেখেও দেখো না
যে-তুমি এখন কি না অনন্ত ডুবুরী।

শান্ত জলে একবার ভাসো, নতুন নিঃশ্বাস ভরো বুকে,
কুড়োনো ঝিনুক নিয়ে শানে ঘসো, যে-কোনো শংখের
আক্ষেপ উত্তাল করো মাতৃদায় গুরুদশা ফুঁয়ে ;
এই মাঠ সেই মাঠ ছিলো ? নদী শস্য আগেকার মতো ?

যা-কিছু হারায় ত-ই দৈবের খণ্ডন ?
আবার ফেরৎ পাই সুলভ বলেই ? তাজা কাঠ
মাৎস্যন্যায় সুখ সন্ধ্যা স্মৃতির চোলাই, হে ডুবুরী
ভাসমান জীবন তোমারও ছিলো, উঠে আসা, নতুন নিঃশ্বাস,
আশেপাশে ডাক দিলে নিমেষেই 'কী' বলে দাঁড়াতো
এইখানে—যেখানে হাড়ের গায়ে
মজ্জা ছিলো, মজ্জা ফুঁড়ে হাড়।

এখন শিশুরা সব

আর ওই শিশুদের নাগাল মেলে না,
তারা এক কৃপণ শশীর মতো পার
ষোলো কলা পার ; ডাঁটো মুঠো নিয়ে তারা
খেয়ে গেছে বিকেলের নিরুপম খালে।
পাড় থেকে ধোঁয়া উঠে বামন দৈত্যের
দেহখানা ফোটামাত্র হুড়মুড় ছুটে
নেপথ্যে পালালো এক আইমা-র কাছে।
যখন মাছের চোখে চপল সখার
দেখা পেলো, আইমা-র মাথা গেলো ঘুরে।

শেষে তাই 'তিলেক দাঁড়াও তবে' বলে
রক্তাক্ত ফুলের মতো বিকেলের স্বাদু
মুখের গহ্বর গেলো যাদুবলে বুঁজে।

মেঝের কারুকার্য

মেঝের উপর লাল জল! মেঝের উপর নীল জল! আড়াআড়ি ঢালু পথে গড়িয়ে যায়। পদ্মফুলগুলি টলমল করে। ঘরবন্দী আমোদের গন্ধগুলি জানলা দিয়ে পথে নামলো। ছেলেপিলেরা যদি বল ভেবে কুড়োয়, হেড দেয়, হাইকিক করে বা রসাতলে পাঠায় পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে চুপসোনো ব্লাডারের মতো। শুধুই কি পদ্ম? কোনো মৃণাল নেই? মদহস্তীর দেখা নেই? সকাল যা করে কাটে—পরীরা আপন ছায়ায় বিভোর হয়ে স্বপ্নের পাদপাদপের ধারে কুড়ে হয়ে বসে থাকে। ছাদ থেকে মাকড়সা জরীপের সুতো নামায়। স্বদেশকে ভালোবাসতে থাকে আর চক্রাকার সীমা বাড়াতে থাকে। স্মৃতির পোষাক রিফু করে আধভোলা মাঝরাতের বর্ণাঢ্য স্বপ্ন আর স্বপ্নের পোষাক নিষ্পলক চোখ।

স্বপ্নেও তা কষ্টকল্পনাই

প্রত্যহ ভোরের ঘণ্টা একই লগ্নে বাজে
সমান আওয়াজে।
সমান উজ্জ্বল তারা ধরণীতে
নামে অশ্রু নিতে।
একই লগ্ন, আশু তার গান—
চতুর্দিকে খাড়া গাছ বাড়ায় বাগান।
কতো দিন কতো হাত-নাড়া
টোড়ি বা কানাড়া ;
বিষয় না থাক তবু বিষয়-সওয়ার
মর্মকথা ছিলো, ছিলো আর
দুষ্টু সেই রাখালের বাঘপড়া পালে
মৃত স্বপ্ন—আজ সে-প্রণয়
আমার দুঃখের হাতে দড়ি নয়,
চাঁদ গুঁজে দেবেই কপালে।

কতোদিন স্মরণ করি না

হাওয়ার আলস্যে যার ঝুঁকে পড়া হাতে
বালার আড়াল থেকে
মনিবন্ধ, উষ্ণ ধাতু বের হয়ে আসে।
আমি তো দেখি না তার প্রত্যহের যাওয়া,
পাখিরাও চলে গেলো বাসা ভেঙে দিয়ে,
প্রত্যহ আসার লগ্নে
ভীষণ গুমোট কেটে বৃষ্টি হয়,
আড়াআড়ি তীরে আসে সাঁতারু সময় ;
কাল যা হারিয়েছিলো বহুদিন আগে
আজ তা প্রেমের মুখে
ধ্বজপদ্মমৎস্যচিহ্ন আঁকা।
মুখে শ্বেত শোভা নয়, কলঙ্কপতাকা।

যখন মুঠো করো

যখন মুঠো করো
যখন বৃষ্টি হবে বলে
আমরা গোল হয়ে বসি
তুমি আর অন্য দু-পাঁচজন
তুমি স্বপ্ন খুলতে লাগলে
আর সবাই ঝুলন্ত
সাইডব্যাগের মতো নির্বিকার
কাহিনীর কুকুরটা
কোনো বিজলি থামের গায়ে
কিছু একটা শুঁকে পেচ্ছাপ সেরে
তোমার কাছেই ফিরলো
আর আমাব শব্দের ছিবড়েয়
কান ঘসতে লাগলো

যখন মুঠো করো
যখন বৃষ্টিতে ভিজে
শেডের তলায় বাসস্টপে দাঁড়াও
আগে যেখানে নীল ঘোড়া ছিলো
এখন সেখানে রূপোলি হরিণ
পরে হয়তো গোধূলি নয়
সাধের অন্য কিছু বরং
শব্দ যে-ভাবেই বাঁচুক
তোমাকে চুপ করাতে জানে না
আর পাঁচজনকে হাসাতে না পেরে
শূন্যে লাফায় জোনাকি

যখন মুঠো করো
যখন দুজনেই বৃষ্টিতে ভিজি

ভরাডুবি থেকে

রাত্রির বিষয়ীভূত ভয়-যন্ত্রণার
শতরঞ্জে আমি ভুলে ঘুমোই, শরীরে
ফেনা নেয় শঙ্খের আকার।

*

আমাদের ঠাণ্ডা হিম ঠোটের চেরাগে
দীপান্তরী আলো কোনো মৃত ষোড়শীর।

*

এখনো তোমার গায়ে ক্ষত আছে খেচর চন্দ্রমা

*

ওই দেখো চলে যায় অক্রূরের রথে
দুপুর হবার আগে ভোরের শিশির।

*

ঈশ্বর, শোকের অস্ত্রে রোদ বলশালী···

*

ফুল চিনতে পারে কোনো দিন
অশ্রুশুল্কে কৃপণ ব্যাপারী ?

*

আটটার কাঁটায় কাল ভুঁইফোড় চাঁদ···

*

···রুক্ষমেঘে দারুণ বর্ষার
প্রেতধ্বনি ; অভিপ্রেত সে-দিন কোথায় ?
এখনি পুবের শস্য খালি হয়ে
পশ্চিমের গোলায় আবীর।

*

অ্যান্টেনা রডের মতো মুখময় দাড়ি বেড়ে ওঠে

*

অথচ একই তো জল নালা দিয়ে নেমে
গাছের গোড়ায় বসে রসায় কুসুম

নিশীথে কপিলা হবে দারুভূত স্তন।

*

এ-দ্বৈরথে
যাবার বেলা-ই এসে ঠিকরোয় মুকুটে।

*

আপন রোশনাই টিপে দূরের মশাল
ভেজালো বন্দরমুখী মোচার জাহাজ।

*

আর স্মৃতি মধ্যাহ্নের নয়ানজুলিতে
প্রতিমার নগ্ন বোড়ে চালি ও কাঠামো।

*

হা ঈশ্বর, ব্যথা
আনন্দের পোতাশ্রয়ে নিমজ্জিত তরী।

*

বেগবান অশ্বের রেকাবে
এখনো ভোরের আলো সজীব রয়েছে।

*

মৃত্যু কি পথের মোড়ে ফায়ার সিগন্যাল ?

*

কায়ক্ষীণ শবে
কে আর দ্বিতীয়বার হানে তীক্ষ্ণ তীর ?

*

পর্দা উঠলে রণক্ষেত্র, নেপথ্যে ঘটনা অশ্বহ্রেষা।

*

সেখানে সন্ধ্যার ধ্বনি বেপমান
দূরের নিশীথ থেকে ঘণ্টা তুলে নিলো।

*

আমাদের স্থলাব্জপিঞ্জরে
সারাদিন সরু বৃষ্টিপাত।

নয়নতারা

I

নয়নতারা বার বার চক্কর দিয়ে ফিরলো।

ভুরু গুটিয়ে দেখলো, সব ঠিক; ভুরু টান করে দেখলো, তা-ও ঠিক। ওর পাশে এক পুকুর—ঠোট গোল করে তোমরা বলো বাপী।

নয়নতারা পুব পাড়ে, পতাকার নাভির মতো নিশ্চল সকাল। আবার পশ্চিম পাড়ে. সন্ধ্যার ত্রিপুণ্ড্রক পতাকার ললাটের মতো সদাকুঞ্চিত।

পুকুরের জলে, হাত-পিছলোনো ঘুমন্ত মাগুরের চোখ-খোলা আয়নায় নয়নতারা ভাসে। কেবলি ডোবে আর ডুবে ভাসে। চুলগুলো পানকৌড়ি, শরীর মাত্র রাজহংসীর কলকণ্ঠ।

দিবায়তের আলো আর রাত্রিবেধের অন্ধকারের মধ্যস্থ বনে চিরনবীন এক শেয়াল ছুটছে তো ছুটছেই। তার বাখারি-তরোয়াল লেজের ধারে গাছতলার মানকচুর ডাঁটাগুলো কচ কচ কেটে যাচ্ছে।

নয়নতারা ভাবলো: এক বামন, তার পাশে এক খরগোশ; কিন্তু কচ্ছপের বার্ধক্য কী?

ভাবলো: খরগোশ, আহা! কোন সায়ংসন্দেহে বাস করে, তবু তীরগুলো ছিলা থেকে ভুস করে মৃগব্যের পেটে ঢোকে।

II

নয়নতারার ভ্রূক্ষেপ নেই, কে তার অপাঙ্গকে ব্যঙ্গ করতে করতে চলেছে, অথবা ছায়াই সেই ব্যঞ্জনা—মৃদঙ্গ বলি আর না-ই বলি।

ভ্রূক্ষেপ নেই, কোন অস্থিরতা তার মোহানায় বেড়-জাল-ফেলা পকুরে কোণঠাসা, অথবা ছায়াই সেই মস্করী—মাথায় নেই দুপুরের তীর্থ বা পায়ে সূর্যাস্তের পাথেয়।

ভ্রূক্ষেপ নেই, কে তার বাঁ-চোখের পাতায় উশখুশ করে, অথবা ছায়াই সেই সংকট—বালিশের তলায় জুজুবুড়ি।

III

'নয়নতারা, ওই না ঘুঙুর বাজে? গলার না পায়ের?' হাসলো 'আমি যে শাপভ্রষ্ট অপ্সরী, কি করে বলি!' আনন্দ নাডু খাই যেমন ঘাড় উল্টিয়ে, বলি

'অপ্সরী তো নদী—শত যোজন দূরেও শ্রুতরবা, সেই নদী

'সন্ধ্যায় জেগে একবার অঞ্জলি ভরে, ভোরে জেগে একবার অঞ্জলি খালি করে; সে-নদীর

'মৃণাল এক-আধবার ঠোঁটের আগায় আসে, তবে ছোঁবার আগেই মিলিয়ে যায়, সে-নদীতে

'মীনপ্রেক্ষা স্রোতের আর্দ্রতা স্ফটিকবিম্বিত—মানুষী অশ্রু তার গভীরতা বাড়াতে অক্ষম।

'আর ও যে তোমার পায়েরই ঘুঙুর। পার্থিব লোকেরাই জানি কোনটা তোমার পা, কোনটা গলা।'

IV

আমার সকাল তোমার বিকেলে জুড়োবার আগে আমার ওষ্ঠ তোমার অধরে, বুকপোড়া প্রদীপের কালিদহে, সলতের পিচুটির মতো নির্বিষ।

V

গহন বনে পথ হারিয়ে ফেললো নয়নতারা।

ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে সুঁদরীগাছের গুঁড়ির কাছে থেমে শুধোয়

'সুঁদরী কাঠ, সুঁদরী কাঠ, আমায় পথ বলে দিবি ?'

'কোন পথ—রাজবাড়ির না ঘুটেকুড়ুনীর কুঁড়ের ?'

'হেই যেটা হোক।'

সুঁদরী গাছের গুঁড়ি পাথর হয়ে গেলো।

হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হিজল গাছের কাছে এলো।

হেই হিজল, দোহাই তোর, ঘুটেকুড়ুনির কুঁড়ের পথ বলে দে

'জানি নে।'

'রাজবাড়ির পথ ?'

'তা-ও জানি নে।'

'তবে তুই যা জানিস, বল।'

সপাং করে হিজলের মাথা আকাশে গিয়ে ঠেকলো।

এখানে ওখানে সেখানে কাঁটার আঁচড়ে নয়নতারার গা বেয়ে রক্ত ঝরছে দেখে এক লাফারু থমকে দাঁড়ালো।

'তুই বোধ হয় জানিস, জানিস কোনো পথ ?'

মানুষের গলা শুনে জোড়ালাফে সুড়ুৎ করে পালালো।

এগোতে এগোতে এগোতে দেখে বিশাল নদী। নদী ডাকলো। নদী কেন ডাকে ? হাউ হাউ বেশ খানিক কাঁদলো নয়নতারা। এখন সে বেশ হাল্কা আর ডানা ছাড়াই উড়ে গেল যেখানে যাবার সেইখানে। কিন্তু ছায়া কোথায় যে পিছু নেবে ?

VI

নয়নতারা তুমিই, বৃষ্টিশিশুদের কবে ডেকেছিলে 'চল নামি'।

তোমার বক্ষস্পন্দনের এক একটি সূক্ষ্ম শরীর অবয়বের ব্যাকুলতায় কালিঝুলি মেখে সঙ সেজে লেপ্টে দাঁড়িয়েছিলো। পৃথক মুখ কারো নেই, তাই কিনা জানি না, কান্না ওদের ভাষা।

সেই একদিনই চুপি চুপি আমার বিছানায় জ্যোৎস্নার চাদর-মুড়ি আনন্দ-সামগ্রী—তুমি শুয়ে ছিলে। পিঁপড়ের মতো আমার পাঁচ পাঁচটি আঙুল তোমার বুকের উপর উজানে পুণ্ডরীক, ভাঁটায় শ্বেতপদ্ম। আর হতভাগ্য ষষ্ঠ আঙুল—তোমার আমার মাঝখানে, শরীকানা বাড়ির এজমালি গলির নিত্য গিরিসঙ্কটে, সুঁচের ছেঁদা বার বার এড়ানো সুতোর মতো চপলমতি।

সুন্দরীর মেলায় যেমন বাঞ্ছিতা—অনেক রাত্রির মধ্যে এক রাত্রি, আর তোমার আইবুড়ো আস্বাদ—গচ্ছিত স্ত্রীধন।

*   *   *

যখন একমাত্র সাঁকো বেয়ে যাই, মাছগুলো কিংবা যা-ই অনুসরণ করুক—তোমারই তো অনুকম্পা, এই ভেবে ফিরেও চাই নি। এখন রৌদ্রদ্যুতিময় গিরিমালা—দোফালি করলার আদলে উপুড়-করা দেখো—জলে-ভেজা হস্তাক্ষরের মতো সহচরীদের আহ্বান আমার সীমান্তে এসে নিভে গেলো।

মায়াবী মেঘের চকিত ত্রাহি-স্বরে, তোমার পলকপাতের পক্ষে যথেষ্ট, আমি দিগম্বর। তখন বুকের হৃদয় সত্ত্বেও তুমি, আর অবশ্যই, সহৃদয়া। আর অসূর্যম্পশ্য পথ বেয়েই তোমার অজান্তে নামলো বৃষ্টিরা—যারা শুনেছে 'জল আমি'।

তবু শব্দ? অমর? তা-ও বৃষ্টির পরে!

তুমি যেখান থেকে পড়লে সেই আকাশই তোমার সূতিকাগার। আর এই আকাশ বুঝি, অসংখ্য কক্ষের যূথদ্বার। দূর থেকে রেলগাড়ির পুকারে যেমন পর্যটকের মনে আকাঙ্ক্ষিত শৈলাবাসের চিত্র ফোটে তেমনি এ-আকাশ সদাধ্মাত নক্ষত্রমঞ্জীরে 'এসো এসো' ডাকতে থাকে আর মহানন্দে জুড়িদারেরা গায় 'হা বু! হা বু! হা বু!'

*   *   *

শৈশবের নদীর চটি থেকে এ-আকাশ, সুসমাচারে মাত্র ক'-পা।

আর নদীই বা এখন কোন ফলগূঢ় অকুস্থলে পতন ও মূর্চ্ছার অপেক্ষায়?

*   *   *

ছোট্ট প্যাগোডা পেঁপেগাছের মটকায় উরুভগ্ন রোদ্দুর চড়ুয়ের সঙ্গে জল্পনারত: কখন পাশ কেটে যায় ডানাকাটা পরী, ব্যাধের শরের আগে আগে।

*   *   *

হা ঈশ্বর! এই কি না আমার দেবদূতের সাজ! দৃষ্টী সাক্ষী, তুই না দৈবের তিলক? কী করে মুখোমুখী হবো, মুখ ফেরাবো? আমারও আকাশ আর পরীরও আকাশ!

*   *   *

আমার গায়ে এখনো কি মূত্রপুরীষের গন্ধ?

নাইয়ের গোড়ায় বাঁশের চোক্তের দাগ?

*   *   *

এমনও হতে পারে—সেই নদী, সেই শৈশব।

ফুলকাটা গেলাসে অন্যান্য বারের মতো পার্থিব সুধাপান আর আস্ত সুপুরির পাশে নির্জীব পানের হাতেখড়ি সকাল—মাথায় অত্যাশ্চর্য আকাশের ছাউনি। ব্যাধের শর ওদিকে যায় না, পরীরাও সযত্নে এড়ায়।

VIII

'সাম্পান উড়িয়ে নেয়ে চলছে দরিয়া থেকে দরিয়ায়।

'প্রথম সাক্ষাৎ জুহুর কপোতের সঙ্গে। দেখলো, ওর ঠোঁটে শ্যামল চিহ্ন নেই, থামলো না। নেয়ের বাবড়ি চুল উড়ছে ফালি ফালি কলাপাতা —জ্যোৎস্নার্দ্র শিশিরে, গুচ্ছনক্ষত্রের শোভার আকর।

'হাওয়া তারা পুব-সমুদ্রের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে।

'এবার কয়েকটি সিন্ধুসারস দেখা দিল। তাড়াতাড়িতে নখের কাদা ধুয়ে আসতে খেয়াল ছিল না। ইতিপূর্বে পদ্মবিলের কিনারায় ওষধি চাক ঠুকরে খাচ্ছিলো। কোনো নতুন দ্বীপের খবর কি ওরা জানে? বা যেখানে গোধূলি গোষ্পদের মতোই স্থাবর এমন জনপদের কথা? বড়ো তাড়া ওদের, আবার বর্ষাও এই-নামি তো সেই-নামি। হাওয়ার দিক বদলের আগেই দেশান্তরী সংবাদ ছুঁয়ে আসতে চায়।

'শেষে ধৈর্যের কিনারায় এসে ঠেকলো ফেনার মাথায় নাচুন্তি কচুরি পানা। কাছেই কোনো ভাঙা গড়, হয়তো নলরাজার; পোড়া উনুনটাও হয়তো আছে, পোড়া শোলমাছটাও।'

এমন নেয়ের কথা নয়নতারা আগে কখনো শোনে নি!

* * *

সেই তীর্থযাত্রীর কথাও না।

'তখন একটু একটু করে ব্যথা জমছিলো বৃহস্পতির প্রৌঢ় মুখে। পায়ের আঙুল নড়তে নড়তে প্রায় নিস্তেজ শেষ রাতের বাতাসের মতো। গাঁয়ে তখনো কেউ কেউ মাঠের বাবলাগাছে বেঁধে আসা ডাকঘুড়ির বিলাপ শুনতে পাচ্ছে।

'স্মৃতি হঠাৎই এলো, ক্ষীরোদ নদী থেকে ছলকে ওঠা আভার মতো মহাবলী;

'আর বাতাস কারো হাত দীর্ঘ করে মুখের স্রোতে ভাসিয়ে দিলো। প্রদোষের আলোয় যাত্রা; যাকে চেনার কথা তার মুখের উপরে মাদী ঘোড়ার চুলের মতো পাণ্ডুর আভা।

'বিকেলের কাঁটার উপরে পা দুটো সহ্য করিয়ে নিলো। তখনো মাঝে মাঝে অথর্ব স্তম্ভের মতো প্রাচীন ঐতিহ্য গায়ে দু-একটা শালগাছ। হঠাৎ নদীটা তার পিছনে, অবিশ্বাসী স্ত্রীর মতো থমকে, পরপুরুষের আকর্ষণে অন্যদিকে চলে গেলো।

'চোখের সামনে এই যে ইষ্টমন্দিরের ত্রিশূল বুনো শুয়োরের দাঁতের মতো মাজা। সিঁড়ির দু-পা আগেই হাড়কাঠ উদাস রূপসীর কোলের আরশির মতো বিস্মৃত—ও কি ঘাড়ের ভার সইতে পারবে?

'মরার আগে বুড়ো বৃহস্পতিটা একবার কাশির আওয়াজও করে নি।'

IX

এসো, এই ভোরের পাপড়িতে মুখ দেখি।

এখানে বিচ্ছেদের খেলনা পাশের আঁশফলগাছের মাথায় কাটা ঘুড়ির জুত হয়ে ভিজে আছে।

আরক্ত এই পাপড়ি গোধূলির মতো—গোধূলির মধ্যে যাওয়া আসা উভয় কাহিনীই যখন ওতঃপ্রোত।

ওই সরোবরে শান্ত মনে স্নান করাই কি যায়! ডুবে যাওয়ার ভয় আছে না? ভেসে ওঠার ভয় আছে না?

ভোরের পাপড়ি এতোই মসৃণ অবতল, কি না সব মুখ গড়িয়ে এক জায়গায়, কিম্ভূতকিমাকার।

X

ট্রামের জানলায় মুখ বাড়িয়ে নয়নতারা দেখলো সব আলোই শুকতারার মতো অস্তগামী, তবে ধ্রুবতারা কোনটা? আশে-পাশে বিস্তর প্রত্যক্ষদর্শী —ফাঁসির-রায়-পকেটে বিচারক—কশাইখানার লাল বেদীতে ধ্যানমগ্ন।

শৈশবের জানলা নয়নতারার হামাগুড়ির সামনে, জাঁতার শম্বুক খোঁদলের মতো, নিষ্পলক।

পা-খলবল পুকুরের শানবাঁধানো চাতালে ভাঙা পুতুলের মেলা—পটুয়ার কোনো সন্তানই ফুলের ডানা ধরে ঝাঁকায় না: পুকুরপাড়ের এ-সংবাদ উপুড়-করা থালার মতো অবান্তর।

আরে! গাড়ি যে বিপথে ছুটছে! সমস্ত আলো ধ্রুবতারার কেশধৃত, স্থির; ছায়াগুলি কেতুপুচ্ছের পিছল ওড়নায় ঢাকা হিমতনু।

'বাবা, তোমার পুতুল যে নড়ে চড়ে' হৈ হৈ রব উঠলো; আর থালায় কড়কড়া ভাত পড়ার আওয়াজ ভুলে চোখের পাতাগুলো ক্রমাগত বুঁজলো।

XI

আমি যে-হাওয়ার অপেক্ষায় তার নাড়ীনক্ষত্র জানে
এমন স্বর্ণলতা লাজুক ছায়ার মাথায় চামর ধরেছিলো

স্বপ্নের ঘর-বাড়ি যেই আচমকা ধূলিসাৎ, অমনি
ঝুমুনো-ঝুমুনোর গলা থেকে বেরোলো বুলবুলি।

তখন সে হাওয়া যদি আসেও, ভাববো
যার ফুৎকার আশা করছি, সে ভিন্নজন।

XII

নয়নতারা আমার আগে আগে ;

হেঁটে তার নাগাল পাই নি, দৌড়ে পাই নি, এমন কি থেমেও না ;

যদি অন্ধের মতো অনুসরণ করে থাকি, সে-ও অন্ধ ;

যদি চক্ষুষ্মানের মতো, সে আমারই চোখ ; আর আয়নাও—আপন চোখের মণি প্রত্যক্ষ করার উপায়, ধানের ছড়া প্রত্যক্ষ করতে যেমন মৌমাছির চোখ।

দুধ-না-জমা চিটের মতো তার অসার রোমাঞ্চ দেখি, সে আমার স্বপ্ন—মুঠো আল্লা হলেও, স্বপ্নই।

দিবালোকের মধ্যে ওস্কানো প্রদীপের শালুক বুঝি সে ; পদ্ম বলবো না—পদ্ম দিগম্বরী। দিবালোক কোনো অপ্রকৃতিস্থ নৃপতি বা প্রকৃতিপুঞ্জ, কেউই সৃষ্টি করি নি।

শুধু আমার পায়ের তলার মাটিতে গড়েছি প্রদীপ, উরুতে সলতে পাকিয়েছি আর মুখের ভাপে তপ্ত করেছি বারুদ।

দেহযষ্টির মতো সম্ভ্রান্ত দীপবৃক্ষ দুটি নেই।

XIII

হাওয়ার দরজা বন্ধ হলো।

বৃষ্টির শরবনে আমরা দুজন পুলকিত খরগোশের মতো ভেজা মাটিকে উপহাস করে চলছিলাম। অষ্টপ্রহর এক প্রহরীর চোখ মুখের উপর ঝলসে যাচ্ছিলো আর—

ঝলসানো সে-আকারের গায়ে শ্বেত ফোঁটা একটি ঝরছিলো টুপ, আরেকটি টাপ।

আর অবারিত মেঘপারের অপার নীলিমা চার কানায় অনবরত গড়িয়ে পড়ছিলো।

নাচ যে দেখাবে, দরজার ওপাশে বন্দী।

পিছন থেকে কেউ কেউ কলকাঠি নাড়ছিলো, আর সামনে যারা তাদের পতন থেকে অসতর্ক কুয়াশা, দিকে দিকে।

এই বরফান মুলুকে আয়ুর মায়ের সাধ্বী প্রতিকৃতি হাওয়ায় দুলছিলো। আর এক পুতুল সদাবিচলিত ঘাড়ে শিশুরা যা-আ করেছে তা-আই সমর্থন করে।

* * *

অবাস্তবের এই দেয়ালে দুলে উঠলো তেলাকুচো-রাঙা পক্ক প্রভাতের পূর্বরাগ। এই সমৃদ্ধ লগ্নে, বা এই নিষ্ঠুর বাগানে, মালীরা 'আর দুটো ফল পেড়ে নাও' আব্দার ধরে। আরো ভরসা দেয় 'আমি বাঘ-ভালুক নই, আর যদি হই-ই তাতেই বা ভয় কী—দাঁত নড়ে গেছে, নখ পড়ে গেছে।' ও-পক্ষ ভাবে, তালুকটাতো তবু হয় নিয়োগীর, নয় চৌধুরীর। বেচারিরা মুখ আমসি করে ফেরে।

নৃসিংহ মামার বাগানে ওরা বহুকাল পেয়ারা চুরি করে খায় নি, মালীর দরজার সামনে বাবলা কাঁটা দিয়ে রাখে নি। খেজুর পাটিতে শুয়ে তবু এই দুঃস্বপ্ন দেখলো : এ-ভাই ও-ভাইয়ের পেটে ভোজালি ঢুকিয়ে ধার পরখ করছে, আর একজন গালের উপর থেকে এঁটেল চুমু খসিয়ে জন্মদিনের লেফাফার মুখ সাঁটছে।

আর শিশুরা ভুলেও ভাবে নি, যেখানে ওরা থাকে, সেটাই ভুতুড়ে বাড়ি।

* * *

একটি আমলকি দেখিয়ে নয়নতারা বললো, এর রঙ অপাপবিদ্ধ শিশুর। পাপের রঙ ধূসর—এবড়ো খেবড়ো হাত যার উপর দিয়ে হেঁটে যায় সেই আতার পিঠের মতো।

পঞ্চমীর চাঁদ যেমন এককানি হয়ে ঝুলে থাকে, পদক্ষেপজর্জর তেমনি পথের ছায়ায় আমলকিটা কুড়িয়ে পেলাম।

এখন বলো, এ-আমলকির স্থাবর হৃদয় কোন শ্বাপদের জাবরের সঙ্গে বিনিময় করি?

* * *

সেতুর উপর দাঁড়ালে সাহস ফিরে আসে।
আর সেতুর তলায় অপরাহ্নের নদী,—
পোষা পায়রার চোখের মতো পাটল।
আমার ছায়া সেতুর সীমা
সেতুর ছায়ার সীমা পার হয়ে জলে পড়ে।
আমি সেতুর উপর, তলায়
অপরাহ্নের নদী,
আর হাঁসের পায়ের পাতায় বৈঠা ঠেলে যায় অনেক ডিঙি,
শোক যেখানে শুল্ক হয়ে ঠেকে—সেই দিকে।
মাঝি মাল্লার কথা ভাবছি, তারা তো নিরাপদ।
ঝড়ের কথা ভাবছি, সুদূরে সে বাসুকী-কুণ্ডলী।
সেতুর উপর দাঁড়ালে সবাই সাহসী।

XV

এখানে জলের রঙ সবুজ,
আকাশের রঙ এলা;
ছায়ার রঙ বেগুনি,
বসন্তের রঙ গেরুয়া।

* * *

টইটুম্বুর দিঘিটা পূর্ববৎ নিস্পন্দ আর আরকের জুড়োনো সরের মতো প্রতিচ্ছায়াহীন।

* • * *

সবশুদ্ধ ক-টি ঘোড়া গেলো বসন্তে জল খেতে নেমেছিলো—জানে-এমন তারার আলোও বেঁচে নেই আর।

XVI

চীনেরা বলে পিহি, যবনেরা ফিনিক্স। জরায়ুজ প্রাণী, কোনোটাই নই। চুমু থেকে সন্তান নির্মাণ করি আর তৃপ্তি থেকে গৃহ : অমনি দরজা-জানলার পর্দা রঙিন করি। তবু যথেষ্ট বাৎসল্য কই আমার চোখে যে এই নৃশংস লীলা দেখবো ?

'…এই স্তম্ভেই আছেন, তোমাকে আমার উরুতে রেখে নিধন করবেন।' আর কী বলে নিবৃত্ত করবে ? এখনও ফলন্ত গাছের তলায় প্রত্যহের পতন পর্যন্ত কোনো জরাই অমোঘ নয়।

বিবেক তোমাকে এই রকমই বলবে : কুমীরের একমাত্র ছানার মতো বারবার বের করে আমাকে দেখিয়ো না।

কৃপণের হাতে বরং গুঁজে দাও, গেঁজের মধ্যে গোপন করুক।

যে-সব কুমারী আমার আংটিতে সিঁদুর মাখাতে চেয়েছিলো তাদের কাউকেই নামাঙ্কিত চিনি না।

আর প্রোষিতভর্তৃকারা—আমাকে তারা নতুন নতুন পার্কে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলো, রেস্তোরাঁর পর্দানশীন কামরায় ঠোকরাতে চেয়েছিলো—তাদের ঘৃণা করি।

সুধাপাত্র নিঃশেষ, তাদের প্রণয়ও তিন তিনবার অস্বীকার করি।

ঈশ্বর এখন নবসিনাই নির্মাণে ব্যস্ত; তাঁর তপোভঙ্গ করো না। একদা তাঁর হাতে একটি তারা লাল হয়ে নিবতে দেখেছি। কতো লীলাই না দেখেছি—যেমন দেখেছি সেই রাত্রি : সিদ্ধাইয়েরও দৃষ্টিহরণে সে সক্ষম। আর আমি

কিম্বা ওই কুমারীরা, প্রোষিতভর্তৃকারা !

তাদের বিরহে, নাভিশ্বাসে আমার আটাশটি বার্ষিক জন্মের জাতক শুনেছি : তার অন্যতম

নয়নতারা তোমাকে না দেখে যেমন,

দেখেও, অন্ধ।

XVII

স্মৃতি, এই জ্ঞাতসার ভোরের রোদ্দুরে প্রথম জাগরিত,

স্মৃতি, এই অজ্ঞাতবাসের মোহময় রোদ্দুর—এক অমিতকায় বৃত্র (বৃত্র-সংহারের কথাই ভাবো : মঘবা ছিলেন গরিষ্ঠ দেবতা—আর এখন তাঁর বজ্রকে গোরুর চোনায় পানেট করতে দিয়েছি) আর সমুদ্র—সমুদ্র থাক, বরং শহরেই ফেরা যাক, সেখানে উপকণ্ঠের গ্রামান্ত থেকে ধানসিদ্ধর ভাপ এসে নাকে লাগে।

* * *

কিছু চাই না, কিছু জোড়া লাগাতেও পারি না; লোকলস্কর ধনদৌলত সত্বেও। গড়াই ও কুমার রাজ্যের দুই সীমা, যদিও রেখামাত্রই; আর সীমা ছাড়া অধিকার······?

বরং সীমার বাইরে সৈকতের দহমান আবাসগুলির কথা স্মরণ করি, আর দুর্যোগের রাতে শৈলকূটের প্রবালমন্দিরের কথা। কাগজের শিকল টাঙানো জ্যোৎস্নার স্ফটিকের মতো যে-ধ্বনি উচ্চারণ করি, সাক্ষীগোপালের সাহায্য ছাড়াই, শিলার গায়ে স্থায়ী দাগ কাটে, রক্তের ট্যাপারির মতো গড়ায় নুড়িগুলি আর দেবীর সর্বাঙ্গ এক নৃমুণ্ডমালী ঝাড়লণ্ঠনের নানা শীষে, এটা থেকে ওটায় লাফিয়ে বেড়ায়। অনাবৃত বুকের সুধাপাত্র, দুজনেই ওদিকে তাকিয়ে—আমি ও আমার উদ্বাহু স্মারক।

· যাকে বাইরে নেভাই, মনে সে তুষানল।

হে দৈবী করুণা, ভয় দিয়েছো যদি,
ভয়ঙ্করকে প্রত্যক্ষ করাও;
বাসনা দিলে যদি,
নির্বাসন দিয়ো না।
স্মৃতিও জানে : নয়নতারা
সুরততৃপ্ত রমণী, পুরুষে আর যেন রুচি নেই।